আর্থসামাজিক অগ্রগতি বিস্ময়কর না হলেও উল্লেখযোগ্য

Policy Research Institute, Bangladesh. | 1

আর্থসামাজিক অগ্রগতি বিস্ময়কর না হলেও উল্লেখযোগ্য

Tuesday, Dec 13, 2011

By Dr. Ahsan H. Mansur

বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি তাদের, যাদের আত্মত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গত চার দশকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি বিস্ময়কর না হলেও সামগ্রিকভাবে আমাদের অর্জনকে উল্লেখযোগ্য বলব। পেছন ফিরে তাকালে অনেক বিষয় নিয়ে অনেকের মনেই হতাশা জাগতে পারে। তবে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা দৃষ্টান্তমূলক।

যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের অবকাঠামো ও আর্থসামাজিক অবস্থা অনেকাংশেই ভেঙে পড়েছিল। নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর তাদের প্রথম কাজই ছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। স্বাধীনতার আগে দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বন্দর নগরী করাচি। এ কারণে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের শূন্যতা ও দক্ষতার অভাব দেখা দেয়। নীতিনির্ধারণ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ভুলভ্রান্তিও হয়েছিল সে সময়। স্বাধীনতার পর বৈশ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সদ্য বিজয় অর্জন করা বাংলাদেশের জন্য মোটেই সহায়ক ছিল না। দ্রব্যমূল্য হঠাত্ করেই বেড়ে যায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও দ্বিতীয় জ্বালানি সংকটের (ঝবপড়হফ ড়রষ ঢ়ত্রপব ◌ংযড়পশ) কারণে। অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক কাঠামো বেছে নেয়া হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর রাশিয়া ও চীনের নীতির প্রভাবেই এ ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। ব্যাংক, শিল্প ও বাণিজ্য খাত রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে এগুলো পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর ফলে শুধু পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তি সরকারের হাতে যায় না, দেশীয় মালিকানায় যেসব শিল্প ও ব্যাংক ছিল, তাও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান টিসিবির মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে। পেছন ফিরে তাকালে আরও দেখা যায়, যদিও তখন এ নীতিমালাকে যুগোপযোগী মনে করা হতো— সেটি আমাদের অর্থনীতির জন্য

আর্থসামাজিক অগ্রগতি বিস্ময়কর না হলেও উল্লেখযোগ্য

Policy Research Institute, Bangladesh. | 2

সামগ্রিকভাবে ক্ষতিকর ছিল। বিশ্ব অর্থনৈতিক পটভূমি বাংলাদেশের জন্য তখন মোটেও সহায়ক ছিল না। বিশ্ববাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য রেকর্ড উচ্চ পর্যায়ে চলে যাওয়ায় বাংলাদেশ প্রচণ্ডভাবে খাদ্যসংকট এবং বহির্বাণিজ্যে বড় ধরনের সংকটে পড়ে। স্থিতি মূল্যে (ত্বধষ ◌ঃবত্সং) বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্য তখন যে পর্যায়ে গিয়েছিল, এখনো সে অবস্থায় যায়নি। এ পরিস্থিতি বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবেও অস্থিতিশীল করে তোলে। স্বাধীনতা অর্জনের পর জনগণ যে স্বপ্নের মধ্যে ছিল, সে স্বপ্ন পূরণ তখন হয়ে ওঠেনি।

যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা পার করে আমরা আজ অনেক দূর এগিয়েছি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্তর ও আশির দশকে গড়ে ৩ থেকে ৪ শতাংশ ছিল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩ শতাংশেরও বেশি। ফলে মাথাপিছু আয় ২০০ থেকে ২৫০ ডলারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অনেক দিন। প্রায় দুই দশক বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় প্রায় স্থির ছিল— ২০০ ডলার বা তার কাছাকাছি। সত্তরের দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হারও ছিল ৭০ শতাংশের ওপর। এমন কঠিন অবস্থার কথা আমাদের হয়তো অনেকের মনেও নেই। বাংলাদেশ বর্তমানে যে অবস্থায় এসেছে, তা অবশ্যই এক দিনে অর্জিত হয়নি। শেষ তিন দশকে দেশের অর্থনীতিতে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। বাণিজ্যনীতিও বহুলাংশে উদার করা হয়। স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশীদের বহির্গমন ও রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ছিল না বললেই চলে। স্বাধীনতা অর্জনের পর এ খাতে আমাদের অগ্রযাত্রা তুলনামূলকভাবে পাকিস্তান ও ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। ভারত বাংলাদেশের চেয়ে ৩ গুণ বেশি রেমিট্যান্স পায়; কিন্তু দেশ হিসেবে তারা আমাদের ১০ গুণেরও বেশি বড়। আর পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এখন অনেক বেশি রেমিট্যান্স পাচ্ছে। স্বাধীনতার আগে পশ্চিম পাকিস্তানই প্রায় সব রেমিট্যান্স পেত। বর্তমানে বছরে ১২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাচ্ছি আমরা। ফলে বাংলাদেশের সঞ্চয়ের হার, যা জিডিপির তুলনায় দশকের ঘরে অর্থাত্ ১৩-১৪ শতাংশে ছিল— সেটা এখন ক্রমান্বয়ে বেড়ে জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশের কাছাকাছি চলে এসেছে। দেশীয় বিনিয়োগ একই সঙ্গে বেড়ে জাতীয় আয়ের ২৪-২৫ শতাংশ হয়েছে।

এসব পরিবর্তনের ফলে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার সত্তর ও আশির দশকে যেখানে ৩-৪ শতাংশ ছিল, এখন তা বেড়ে সাড়ে ৬ শতাংশ হয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হারও ৭০ থেকে প্রায় ৩১ শতাংশে নেমে এসেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ থেকে এক শতাংশের কাছাকাছি নেমে এসেছে। সামাজিক খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত এবং অনেক ক্ষেত্রেই উদাহরণমূলক। আমাদের এ পরিবর্তনের মূলে কাজ করেছে সাধারণ মানুষের উদ্যম, উত্সাহ ও কর্মস্পৃহা। ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের সফল প্রচেষ্টা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর (এনজিও) উদাহরণমূলক কর্মকাণ্ড এমন অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা, আশাসহ বেশকিছু এনজিওর কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও বিশ্বপরিমণ্ডলে তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করেছে। বিশ্বে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে তারা। আমাদের দেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষামূলক অগ্রগতিতে এনজিওর ভূমিকা

আর্থসামাজিক অগ্রগতি বিস্ময়কর না হলেও উল্লেখযোগ্য

Policy Research Institute, Bangladesh. | 3

অনস্বীকার্য। পরিতাপের বিষয়, আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে একই রূপ গতিময়তা থাকলে দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি ওপরে বর্ণিত ‘উল্লেখযোগ্য’ অবস্থা থেকে হয়তো ‘বিস্ময়কর’ অবস্থায়ও চলে যেতে পারত। রাজনৈতিক দুর্বলতা, প্রশাসনের অদক্ষতা ও সুশাসনের অভাব আমাদের পেছনে টেনে রেখেছে। এ দুই ক্ষেত্রেই দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে ৮ থেকে ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন বাংলাদেশের জন্য কঠিন কিছু ছিল না। আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মতো না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। এ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দারিদ্র্যমুক্ত ও উচ্চ প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন দেশ গড়ার ক্ষেত্রে চাই উপযুক্ত সামগ্রিক পরিবেশ। জনগণের সহায়তায় এটা তৈরি করতে হবে রাজনীতিকদেরই।

ড. আহসান মনসুর : অর্থনীতিবিদ ও নির্বাহী পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট